আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের স্বরূপ ও নিদর্শন

মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকি
পিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

"তুমি বল, তিনিই আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ স্বয়ং সম্পূর্ণ সর্বনির্ভরস্থল। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।"

মহান আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষের অন্যান্য সকল সমস্যা বা বিষয়াদি আবর্তিত হয় এই বিষয়কে কেন্দ্র করে যে আল্লাহ্ আছেন বা নেই। আল্লাহ্ যদি থাকেন তাহলে সবকিছু এক প্রকারে বা একভাবে দেখা হবে। আল্লাহ্ যদি না থাকেন তাহলে সবকিছু অন্যভাবে দেখা হবে। পৃথিবীতে উভয়প্রকার মানুষ আছে। এক প্রকার মানুষ যারা আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। আর এক প্রকার মানুষ আছে যারা আল্লাহ তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। তারা বলে যে, কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। সবকিছু এমনিতেই হয়েছে এবং কোন নিয়ন্ত্রন কর্তা ছাড়া সবকিছু প্রাকৃতিক নিয়মে চলছে। প্রকৃতির বিধান অপরিবর্তনীয়।

তারা বলে, রূহ বলে কিছু নেই, ম্যাটার (matter) বা বস্তু-ই সবকিছু। সবই শরীর সর্বস্ব, যা মারা গেলে মাটিতে মিশে যাবে। কোন কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। মৃত্যুর পর কোন জীবন নেই। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নেই।

যারা আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে তারা বলে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং অবশ্যই আছেন এবং তিনিই আল্লাহ। এ সবকিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টিকে লালন পালন করেন। তিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই সবকিছু নিয়ন্ত্রন করেন। কোন কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রনের বাইরে নয়। তিনিই সবকিছু জীবিত রেখেছেন এবং রক্ষা করছেন। তিনি রক্ষা না করলে কিছুই বেঁচে থাকতে বা টিকে থাকতে পারে না।

২. আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দার সাথে সরাসরি সম্পর্ক রাখেন। তিনি তাঁর পবিত্র এবং প্রিয় বান্দার সাথে কথাও বলেন।

৩. মানুষ সৃষ্টি অনর্থক নয়। মানুষকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ আল্লাহ্‌র সকল নির্দেশ মেনে চলবে এবং ইবাদত করবে। এভাবে সে আল্লাহ্‌র রং এ রঙ্গীন হবে। অর্থাৎ তার মধ্যে আল্লাহ্‌র গুণাবলী সৃষ্টি হবে। এবং সে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করবে। মানুষ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যমে পরম শান্তি বা আরাম ও সাফল্য লাভ করবে। রূহ বা আত্মা এমন জিনিষ যে আল্লাহ্‌র সান্নিদ্ধ্য ব্যতিত শান্তি বা আরাম পায় না।

৪. প্রকৃতির বিধান Autometic বা এমনিতে অনায়াসে সৃষ্টি হয় নি। আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন এবং নিয়ন্ত্রন করছেন। মানুষের মঙ্গলের জন্য সবকিছু করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিত একটি পাতাও নড়ে না।

৫. মানুষের মাঝে রূহ বা আত্মা আছে। এই রূহ অনন্ত কাল পর্যন্ত জীবিত থাকবে। মৃত্যুর পরে এই রূহ্ নতুন জীবন লাভ করবে। মানুষের কর্মের বিচার হবে। সে ভাল করেছে না মন্দ করেছে। মন্দ করলে শাস্তি হবে। ভাল করলে পুরস্কার পাবে।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যাবধান। যারা বিশ্বাস করে না তাদের সন্দেহের বা অবিশ্বাসের কারণ দূর হওয়া উচিত। আল্লহ্‌র অস্তিত্বের প্রমান অনেক। বহু যুক্তি দিয়ে প্রমান করা যায়।

যারা বিশ্বাস করে না, তারা কেন করে না? তারা মনে করে যে, (১) তারা খোদাকে চোখে দেখে না। তাদের মতে কোন প্রমানও নেই যে, বিবেক দিয়ে বিবেচনা করা যায়।

আল্লাহ্‌কে চোখে দেখা যায় না, অতএব আল্লাহ্ নেই এটি কোন যুক্তি হোল না। কারণ আরো অনেক কিছুর অস্তিত্বে সবাই বিশ্বাস করে অথচ চোখে দেখে না। না দেখেও বিশ্বাস করে অবিশ্বাস করতে পারে না। অথচ সেগুলো চোখে দেখা যায় না।

বিদ্যুৎকেও চোখে দেখা যায় না। কিন্তু সবাই বিশ্বাস করে যে বিদ্যুৎ আছে। প্রেম ভালবাসা চোখে দেখা যায় না। অথচ এতে সবাই বিশ্বাস করে এবং এগুলো অনেক বড় বড় শক্তি। গ্যাস চোখে দেখা যায় না। কিন্তু গ্যাস ব্যবহার হচ্ছে আমরা চুলা জালাচ্ছি। গাড়ী চালাচ্ছি। চোখে না দেখলেও বিবেকের কাছে গ্রহন যোগ্য অনেক যুক্তি আছে।

মানুষ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, বিশাল বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তাকে চোখে দেখতে চাওয়াও বাড়াবাড়ি। বিশ্ব-জগতের মাঝে মানুষ একটি অতি ক্ষুদ্র বিন্দুর চেয়ে বড় কিছু নয়। সে কি করে আশা করে যে স্রষ্টাকে দেখবে। কিন্তু না দেখলেও মানতে হবে। আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে আমরা বেঁচে আছি। আনন্দ করে বেড়াচ্ছি। তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া এক মুহূর্তও আমরা বাঁচতে পারি না।

আল্লাহ্‌র গুণাবলী (সিফাত) atributs দিয়ে খোদাকে জানতে হবে। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমানের জন্য বড় বড় তিনটি বিষয় উল্লেখ করা যায়- (১) সমগ্র সৃষ্টি। (২) মানব জাতির শ্রেষ্ট হযরত মুহাম্মদ (সা.) (৩) কুরআন মজিদ আল্লাহ্‌র কালাম।

সৃষ্টির রহস্যকে বিচার করলে দেখা যায় যে মহা শক্তিশালী অদৃশ্য সৃষ্টিকর্তা ব্যতিত এই বিশ্ব কখনই সৃষ্টি হয় নি।

আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত পবিত্র এবং অনেক বড়। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তিনি অতুলণীয় 'লাইসা কামিসলিহি শায়উন'। আল্লাহ্‌র মত বা তাঁর অনুরুপ কিছু নেই। 'লা তুদরেকুহুল আবসার' চোখ তাকে দেখার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু তিনি তাঁর সিফাত বা গুনাবলীর মধ্য দিয়ে সর্বক্ষন বিকশিত, দর্শনীয় এবং লক্ষ্যনীয়। আল্লাহ্‌র সিফাতকে দেখে তাঁর অস্তিত্বের প্রমান পাওয়া যায়। যেমন বিদ্যুৎ দেখা যায় না। কিন্তু যখন বাল্‌ব জ্বলে উঠে তখন বোঝা যায় যে বিদ্যুৎ এসে গেছে।

আমি সংক্ষেপে তিনটি সিফাত থেকে কয়েকটি প্রমানের উল্লেখ করতে চাই। প্রথমত : রাব্বুল আলামীন সিফতের বিকাশের কথা বলি।
আল্লাহ্ সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সৃষ্টির প্রতিটি বস্তু বা প্রাণীকে লালন পালন করেন। বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করে যে, একদিন

এই সৃষ্টির কিছুই ছিল না। একসময় সর্বপ্রথম বিগ ব্যাং বা মহা বিস্ফোরন ঘটেছে। তারপর দেখা গেছে যে এক ধরনের সুপ বা ঝোলের মত আধারের মাঝে পরমানু সাঁতার কাটছে। এর থেকে কোটি কোটি বছরে আবর্তন ও বিবর্তনের ফলে আজকের এই বিশ্বজগত সৃষ্টি হয়েছে। আজকে সৃষ্টির মধ্যে চমৎকার নৈপূণ্য দেখেই মনে করা হয়েছে যে, এসব অটোমেটিক হয়েছে। অথচ হর হামেশা সৃষ্টি ও ধ্বংস জারি আছে। পুরাতন ধ্বংস হচ্ছে আর নতুন সৃষ্টি হচ্ছে। যিনি শক্ত হাতে এসব নিয়ন্ত্রন করছেন তিনিই আল্লাহ্। তাঁর নিয়ন্ত্রন ছাড়া কিছুই হচ্ছে না।

আমরা যে বিশ্বজগত দেখছি, এর নভোমন্ডলে কোটি কোটি সূর্য বিরাজ করছে। বলা হয়েছে যে সূর্যের সাথে কোন বড় নক্ষত্রের ধাক্কা লাগার ফলে সূর্যের একটি অংশ ভেঙ্গে পৃথক হয়ে যায়। তারপর কোটি কোটি বছরে ঠান্ডা হয়েছে এবং এর মাঝে সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে।

প্রথমে উদ্ভিদ সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। বলা হয়েছে সর্ব প্রথম সমুদ্রে উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়েছে, তারপর ভূপৃষ্ঠে। তারপর প্রাণী সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। বিস্তারিত বিবরণে যাওয়া সম্ভব নয়। ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদ সৃষ্টি শুরু হয়েছে ৪০কোটি বছর পূর্বে। তারপর জীবজন্তু।

মানুষও একদিনে এমন অবস্থা লাভ করেনি। হাজার হাজার বছরে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। বলা হয়েছে ৪০ হাজার বছর পূর্বেও আমাদের মত মানুষ ছিল।

আল্লাহ্‌র প্রথম নবী হযরত আদম (আ.) ৬ হাজার বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে তা এই যে, এই বিশ্বজগতের কোন শেষ প্রান্ত নেই। অসংখ্য নিহারীকা (গ্যালাক্সি) আছে। এক এক গ্যালাক্সি বা নক্ষত্রপুঞ্জে হাজার হাজার সূর্য আছে। আমাদের সূর্য বা আমরা যে গ্যালাক্সিতে আছি বলা হয়েছে যে এই গ্যালাক্সিতে আনুমানিক ১০০০ কোটি নক্ষত্র আছে। এগুলো সব সম্প্রসারিত হচ্ছে। নতুন সৃষ্টিও হচ্ছে। ধ্বংসও হচ্ছে। তারপরও বেড়েই চলেছে।

কুরআনকে এজন্য মানতে হবে যে, কুরআনে ১৪০০বছর পূর্বে যেসব তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে তা মানুষ তখন কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু আজ বিজ্ঞানীরা গবেষনা করে তা বলছে। মানুষ এক সময় মনে করত যে, পৃথিবী স্থির হয়ে আছে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। কিন্তু পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। কিন্তু আজ বিজ্ঞানীরা বলছেন, পৃথিবী এবং সকল গ্রহ নক্ষত্র নিজ কক্ষ পথে ঘুরছে। কুরআন মজিদে বলা হয়েছে চন্দ্রকে ধরে ফেলার ক্ষমতা সূর্য্যের নেই এবং রাত দিনকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না। আর এরা প্রত্যেকেই (নিজ নিজ) কক্ষপথে ধাবমান রয়েছে। (সূরা ইয়াসিন-৪১)

তারপর গ্যালাক্সিগুলোও সম্প্রসারিত হচ্ছে। কুরআন বলছে : আমরা এক (বিশেষ) ক্ষমতাবলে আকাশ বানিয়েছি এবং অবশ্যই আমরা একে সম্প্রসারিত করে চলেছি। (সূরা আয যারিয়াত, ৪৮) বিজ্ঞানীরা আজ আবিস্কার করছেন। এসব কথা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে ১৪০০ বছর পূর্বে ওহী করে বলা হয়েছে যা কুরআন শরীফে লেখা আছে।

এ রকম শত শত হাজার হাজার তথ্য কুরআন শরীফে দেয়া হয়েছে। যা মানুষ কখনও জানত না। তিনি সৃষ্টিকর্তা তাই তিনি এসব কথা জানতেন এবং তিনি বলেছেন। তিনি সৃষ্টিকর্তা না হলে এসব কথা কি করে বলেছেন? মানুষকেও এসব জানার বা আবিস্কার করার ক্ষমতা আল্লাই দিয়েছেন যেন তারা আল্লাহ্‌র মহিমা প্রত্যক্ষ করতে পারে।

বিজ্ঞানীরাও বিভিন্ন সময় স্বীকার করেছেন যে, এই সৃষ্টি অবশ্যই একজন স্রষ্টার সৃষ্টি। এমনি এমনি হয়নি। বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটন একজন স্রষ্টার কথা বলার কারনে তাকে (ট্রিনিটি কলেজ) ক্যাম্ব্রীজ ইউনির্ভাসিটির শিক্ষকতা থেকে চাকুরীচ্যুত করা হয়েছিল। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনও বলেছিলেন যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। কিন্তু পরে পাদ্রীদের ভয়ে অস্বীকার করেছিলেন। ডঃ আব্দুস্ সালাম একজন বিশ্ববিখ্যাত পদার্থ বিদ বিজ্ঞানী তিনিও এক খোদার উপর বিশ্বাস রাখতেন এবং ইবাদত গুযার আহমদী মুসলমান ছিলেন। আগামীতে বড় সংখ্যায় বিজ্ঞানীরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের কথা বলবেন।

আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র, উদ্ভিদ জগৎ, প্রাণী জগৎ যা-ই বলেন দুইটি প্রধান সৃষ্টি (১.) বস্তু/ matter (২.) প্রাণ।

matter বা বস্তু সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছিল এর সবচেয়ে ছোট বিন্দু বা কণা atom এটম। একে ভাঙ্গা যায় না। এখন পর্যন্ত মোট ৯২ প্রকার এটম আছে বলে জানা গেছে। পূর্বে এর সংখ্যা অনেক কম বলা হোত। আস্তে আস্তে এগুলো আবিস্কার হয়েছে। একই ধরনের অনেকগুলো atom এটম মিলিত হয়ে বিভিন্ন উপাদান, elements সৃষ্টি করে। সোনা-চান্দি, অক্সিজেন, গ্যাস, প্যারা, রেডিয়াম, ইউরোনিয়াম ইত্যাদি। প্রথমে বলা হয়েছে atom বা পরমানুর চেয়ে ছোট আর কিছু নেই আর এটি ভাঙ্গাও যায় না। পরবর্তীতে জানা গেল যে, atom-ও ভাঙ্গা যায় এবং এর মধ্যে অনেক কণা আছে যা ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন নামে পরিচিত। সমস্ত সৃষ্টি উপর বিচার করে একথা বলা যায় না যে কোন সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই এসব কিছু হয়েছে এবং নিয়মিত সচল ও সক্রিয় আছে।

তারপর আর একটি জরুরী বিষয় প্রাণ বা জীবন, ষরভব । এটি কি, কোথা থেকে আসলো? এর কোন আকার/আকৃতি নেই, ওজন নেই, এর দৈর্ঘ্যও নেই প্রস্থও নেই।

প্রকৃতি থেকে অর্থাৎ matter/বস্তু থেকে সৃষ্টি হয়েছে? এটি তো প্রাণ। এতে এত শক্তি যে এটি আকাশ ও সমুদ্রকেও জয় করেছে। একটি গাছের শেকড় পাথরকে ছিদ্র করে বের হতে পারে। একটি সচ্ছ কোষ/ পবষষ যার মধ্যে মবৎস জীবানু বা বীজ থাকে যা থেকে জীবন সৃষ্টি হয়। এটি কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে? কে সৃষ্টি করেছে?

তারপর দেখুন, মানুষ কথা বলতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, বলতে শিখিয়েছেন। (আর রাহমান ৪-৫)

কথা বলতে কে শিখিয়েছেন? কারো কাছ থেকে না শুনে না শিখে কেউ কথা বলতে পারে না। অতএব মানতে হবে যে, সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তালাই মানুষকে কথা শিখিয়েছেন।

অন্যান্য প্রাণীর মতই মানুষ ও প্রাণী। কিন্তু মানুষের মাঝে রূহ বা আত্মা আছে। মানুষ কথা বলতে পারে। মানুষ মত বিনিময় করতে পারে, পরামর্শ করতে পারে। অন্যান্য কোন প্রাণী তা পারে না। কথা বলার ক্ষমতা কে দিল? বুদ্ধিমান কে বানাল? বড় বড় হিসাব মানুষ করতে পারে, গননা করতে পারে। অন্য প্রাণী তা পারে না। যদি আল্লাহ্ না থাকতেন এবং সব কিছুই প্রকৃতির নিয়মে হতো তাহলে সবাই একই ধরনের হতো। কোন ব্যতিক্রম থাকতো না। সবকিছুতেই ব্যতিক্রম আছে। ব্যতিক্রম গুলো দেখে বিশ্বাস করতে হয় যে, কেউ একজন নিয়ন্ত্রন কর্তা অবশ্যই আছেন।

১. আরো দেখুন; মানুষ বা অন্যান্য সৃষ্ট জীব বা যা কিছু - এসব কিছুর মধ্যে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। জড় পদার্থগুলে নড়াচড়াই করতে পারে না। তারপর উদ্ভিদ। এদেরও সীমাবদ্ধতা আছে। অনেক বড় হতে পারে না। আম গাছ হাজার ফুট উচু হতে পারে না। প্রাণী জগৎও অনেক সীমাবদ্ধতা নিয়ে বেঁচে আছে। ঘোড়া ঘন্টায় হাজার মাইল দৌড়াতে পারে না। মানুষেরও বহু সীমাবদ্ধতা আছে। অথচ মানুষ সবচেয়ে শক্তিশালী। মানুষের দৃষ্টি সীমিত, শ্রবনশক্তি সীমিত।

যদি কোন মহাশক্তিশালী স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা এসব কিছু নিয়ন্ত্রন না করতেন, এরা যদি স্বাধীন থাকত নিজেরা স্রষ্টা হোত তাহলে এরা সীমাবদ্ধতা নিজেদের জন্য গ্রহন করত না।

আবার দেখুন, ২. প্রত্যেকটি বস্তু বা প্রাণী অসম্পূর্ণ। নিজেরা স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। অনেক

কিছুর সাহায্যে জীবন ধারন করে। মানুষ শ্রেষ্ট। কিন্তু সেও তো জীবনে বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুর সাহায্য নিয়ে বেঁচে থাকে। পানি, খাদ্য পোশাক, ঘরবাড়ী, অজস্র অপূর্ণতার মাঝে সে নিজে কিভাবে সৃষ্টি হয়ে গেল? নিশ্চয় তাকে কেউ সৃষ্টি করেছে।

অতএব একজন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আছেন। যিনি লালন পালন করেন। রক্ষনাবেক্ষন করেন। এমন সৃষ্টিকর্তা যিনি সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি হোত না। কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তা অবক্ষয় মুক্ত। তিনি এক অদ্বিতীয়। বাকী সবকিছু ক্ষয় প্রাপ্ত। তিনি ব্যতিত কোন কিছুই একক নয়, অদ্বিতীয় নয় বরং সব কিছুরই অনুরুপ আরো অনেক কিছু আছে। এটি আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের বড় প্রমাণ।

প্রশ্ন করা হয় যে খোদা কোথা থেকে আসলেন?

উত্তরঃ খোদা যদি কারো মুখাপেক্ষী হন তাহলে তো তিনি খোদা হতে পারেন না। তাকে যদি কেউ পয়দা করে তাহলে তো সে স্রষ্টা নয়-সৃষ্টি। যেমন : সূরা ইখলাসে বলা হয়েছে, খোদা স্বয়ং সম্পূর্ণ। হামেশা ছিলেন, আছেন, থাকবেন। (সূরা ইখলাসঃ ৩-৪) তিনি কে? কিভাবে থাকেন? এটা মানুষের বোধগম্য নয়। মানুষের মেধা তো সৃষ্টির রহস্য সমূহের খুব ছোট একটা অংশ। সে এর বেশী জ্ঞান ধারন করতে পারে না।

এতক্ষন আমি রাব্বুল আলামীনের গুনের কথা বললাম। এবার আল্লাহ্‌র অপর এক গুন বা সিফাত 'কথা বলা'। এ সম্পর্কে একটু বলছি। খোদা বাণী নাযিল করেন বা নিজে কথা বলেন। মানুষকে কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন। রাব্বুন গুণের এর বিকাশ যখন একজন মানুষ পূর্ণ মাত্রায় লাভ করে তখন তার মাঝে রহমানের বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তার সাথে কথা বলেন।

যে মানুষ রাব্ব সিফত দ্বারা পুরোপুরি উপকৃত হয় তখন সে রহমান সিফাতের বিকাশস্থল হয়। অর্থাৎ রাব্ব তাকে উত্তম মানুষ বানান। তখন সে রহমান খোদার নিকট থেকে হেদায়েত লাভ করে। আল্লাহ্‌কে জানতে পারে। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান লাভ করে। এবং এর ফলে সে আল্লাহ্‌র ইবদত করে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ্‌র প্রেমে আশক্ত হয়। এক পর্য্যয়ে আল্লাহ্‌ তার সাথে কালাম করেন বা কথা বলেন।

এক রেওয়ায়াত অনুসারে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী আবির্ভূত হয়েছেন। তারা সবাই আল্লাহ্‌র কালাম প্রাপ্ত হয়েছেন। আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপে অংশ নিয়েছেন। অগনিত আউলিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ্‌র বাণী শুনেছেন। যেমন : হযরত পীর আব্দুল কাদের জিলানী প্রমুখ। প্রত্যেক যুগে কিছু মানুষের সাথে আল্লাহ্‌ কথা বলেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশ্রেষ্ট মানব-সর্বশ্রেষ্ট নবী। তিনি সর্বশ্রেষ্ট গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছেন। কুরআনের সমস্ত আয়াত থেকে প্রমান হয় যে, এটি মানুষের রচনা নয়। আল্লাহ্‌র কালাম। আল্লাহ্‌ তা'লা এটি নাযেল করেছেন।

মানুষ যতবেশী গবেষনা করবে, বিজ্ঞান যত উন্নতি করবে ততবেশী কুরআনের মর্যাদা প্রকাশ পাবে। মানুষ মানতে বাধ্য হবে যে কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম। অতএব আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রামানের কোন অভাব নেই। কুরআন আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের জন্য বিরাট নিদর্শন।

কোন মানুষ এমন নেই যে কখনও কোন ভুল কথা বলে না। কোন কিতাব নেই যার প্রত্যেকটি বাক্য গভীর অর্থপূর্ণ তাৎপর্য্য পূর্ণ। কিন্তু কুরআন মজিদ এমন কিতাব যাতে কোন ভুল বা দুর্বল বাক্য নেই। কখনোই এর কোন তথ্য অসত্য প্রমাণিত হবে না। 'যালিকাল কিতাবু লারাইবা ফিহে' (সূরা বাকারা:২)

এমনি কিতাব যার প্রত্যেক আয়াত মহামূলবান, গভীর অর্থ বহন করে। এতে কোন ভুল তথ্য নেই। কোন অসত্য কথা মানুষের জন্য অকল্যানকর কোন বাক্য নেই। সারা পৃথিবীর সকল জাতির সকল মানুষের জন্য মঙ্গল ও কল্যান বহনকারী কিতাব। চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে যে এর কোন একটি সূরা বা আয়াতের মত সূরা বা আয়াত কেউ রচনা করতে পারবে না। তহালে এই কিতাবের রচয়িতা বা বর্ণনাকারী বা নাযেল কারী মহান আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ নেই যেমনটি দাবী করা হয়েছে। মানুষ মানুক বা না মানুক এতে কোন সন্দেহ নেই। এত গভীর জ্ঞানগর্ভ কিতাব কোন মানুষ রচনা করতে পারে না। কারণ সৃষ্টির রহস্য কেউ জানে না, কারো এমন জ্ঞান নেই। কেবল মাত্র বিশ্ব স্রষ্টা যিনি তিনিই সৃষ্টির গভীর রহস্যকে জানেন যা তিনি বর্ণনা করেছেন। কুরআন শরীফে হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণী আছে এবং যুগে যুগে তা পূর্ণতা পেয়ে আসছে, পূর্ণতা পেতে থাকবে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) সৃষ্টির সেরা মানব। তাঁর (সা.) এর চেয়ে বেশী উন্নত বা উচ্চতর মানব কখনই সৃষ্টি হয়নি হবেও না। তাই তাঁর প্রতি এমন মহামূল্য বা গ্রন্থ নাযেল হয়েছে। যেদিন প্রথম হযরত জিব্রাঈল ফেরেস্তা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়ে বললেন- ইকরা পড়। তিনি বললেন 'মা আনা বে কারী' আমি পড়তে জানি না। হযরত জিব্রাঈল তাকে জড়িয়ে ধরে জোরে জোরে চাপ দিলেন। তিনবার এমন হওয়ার পর জিব্রাঈল বললেন 'ইকরা বিসমে রাব্বি কাল্লাযি খালাক্ব'।

তুমি আল্লাহ্‌ যিনি মহান সৃষ্টিকর্তা তার নামে পড় তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) পড়লেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঐ জনশুন্য হেরা গুহায় কোন ভয় পেলেন না। এদিন থেকে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ হয়ে গেলেন। আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনলেন। সর্বকালের জন্য আল্লাহ্‌ তা'লা তার সাথি হয়ে গেলেন। এরপর থেকে আল্লাহ্‌ প্রতিনিয়ত তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি সর্বদা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করেছেন। আল্লাহ্‌ সর্বক্ষন তার সাথে ছিলেন। তিনি এক মুহুর্তের জন্যও কখনো অনুভব করেননি যে, আল্লাহ তার সাথে নেই। তিনি কি উম্মাদ ছিলেন যে তিনি সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র সমর্থন পাচ্ছেন অথচ আদৌ কোন খোদা নেই? এমনটি তো হতে পারে না।

তাঁর কর্মকান্ড, তাঁর কথাবার্তা, তাঁর ভাষন বা বক্তব্য, তাঁর কর্মে তাঁর বক্তব্যের প্রতিফলন দেখে এটাই প্রমাণ হয় যে সর্বদা তার সাথে আল্লাহ্‌র সক্রিয় সমর্থন ছিল। তিনি কখনোই কোন অসংলগ্ন কথা বলেন নি।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌ তা'লার তাজাল্লীর বা জোত্যির বিকাশস্থল ছিলেন। তাঁর (সা.) এর প্রতিটি বাক্যই বড় মাহাত্ম্যপূর্ণ হতো এবং এটি প্রমানিত সত্য।

বদরের যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে হুযুর (সা.) সাহাবাদের দেখিয়েছিলেন যে, এই জায়গায় আবু জাহাল মরে পড়ে থাকবে, এই জায়গায় অমুক মরে পড়ে থাকবে.....। আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া হযরত মুহাম্মদ (সা.) কিসের উপর ভিত্তি করে এরকম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল, ঠিক ঐ ঐ স্থানেই তাদের লাশ পড়ে ছিল।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ বলছেন : সে নিজ প্রবৃত্তির বশেও কথা বলে না। ইহা কেবল এমন ওহী যা (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) ওহী করা হয়েছে। (সূরা নযম ৪,৫)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) অবশ্যই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের জন্য নিদর্শন স্বরুপ। আল্লাহ্‌ তা'লার আর একটি গুণ এই যে তিনি দোয়া কবুল করেন। মানুষের আকুতি মিনতি কান্নাকাটি শোনেন এবং মানুষের আবদার রক্ষা করেন।

তিনি বলেছেন-এবং আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার সম্বন্ধে জানতে চায় তখন তুমি বল, নিশ্চয় আমি তাদের নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। (সূরা বাকারা: ১৮৭)

দোয়া কবুলের বিষয়টি আদিকাল থেকে চলে এসেছে। প্রত্যেক যুগে আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের দোয়া শুনেছেন। এখনও শোনেন। যে কোন মানুষের দোয়া তিনি শুনতে পারেন। অবিশ্বাসীদের দোয়াও শোনেন। ছোট বড় যে কোন মানুষের দোয়া কবুল হতে পারে। আবু জাহালের দোয়াও শুনেছিলেন।

আবু জাহাল বলেছিলেন, যদি মুহাম্মদ (সা.) সত্য দাবীকারক হন তাহলে আমাদের উপর

পাথর বর্ষিত হোক। বদরের যুদ্ধে এটাই হয়েছিল। আল্লাহ্ তার বান্দাকে এতটা মর্যাদা দিয়েছেন, যে কোন মানুষের দোয়া তিনি শোনেন বা শুনতে পারেন।

বদরের ময়দানে মক্কার মুশরেকীন তথা পৌত্তলিকদের ১০০০বাহাদুর সৈন্য রণকৌশলে অভিজ্ঞ এবং পারদর্শী। অপর দিকে মদিনার ৩১৩অনভিজ্ঞ কৃষিজীবি মুসলমান দন্ডায়মান। মুশরেকরা মক্কার মুসলমানদের পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) দোয়া করছেন- আল্লাহুম্মা ইন তুহলিক হাযিহিল ইসাবাতা মিন আহলিল ইসলামে ফালা তু'বাদ্ ফিল আরযে আবাদা (মুসনদ আহমদ) অর্থাৎ হে আল্লাহ! আজ এই মুষ্টিমেয় মুসলমান ছোট্ট দলটি যদি ধ্বংশ হয়ে যায় তাহলে হে আল্লাহ্ ! তোমার ইবাদত কে করবে? কখনই আর তোমার ইবাদত হবে না।

আল্লাহ্ বললেন (যুদ্ধের সময়) তুমি এক মুঠ নুড়ি মুশরেকদের উদ্দেশ্যে ছুড়ে মার। হুযুর (সা.) এক মুঠি নূড়ি ছুড়ে মারলেন। দেখতে দেখতে প্রচন্ড ঝড় সৃষ্টি হোল এবং মক্কার বিশাল বাহিনী ধরাশায়ী হোল। এগুলো সবই আল্লাহ্‌র নিদর্শন। এটি কে করেছিলেন? যদি বলেন ঝড় প্রকৃতির নিয়মে এমনিতেই হওয়ার কথা ছিল তাহলে বলুন হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে কে ওহী করেছিলেন?

কোন কিছু দিয়ে প্রমান করা যাবে না যে, প্রকৃতির কারনে এমনিতেই হয়েছিল। কুরআন বলে এটি আল্লাহ্ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ...আর তুমি নিক্ষেপ করনি যখন তুমি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলে বরং আল্লাহ্ স্বয়ং নিক্ষেপ করেছিলেন... (সূরা আনফালঃ ১৮)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দোয়া সবসময় কবুল হোত, ব্যক্তিদের জন্যও কবুল হয়েছে এবং জাতির জন্যও কবুল হয়েছে। মাত্র কয়েক বছরে আরবে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছিল তার কোন যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝানো যাবে না। চুড়ান্ত ও চরম সত্য কথা এই যে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দোয়াতে আরবের মরুভূমিতে বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। মক্কা ও আশে পাশের আরবরা কেমন ছিল? তাদের মধ্যে সভ্যতার কিছুই ছিল না। কিন্তু ইসলাম গ্রহনের ফলে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কল্যানে তারা সবাই অতি উত্তম চরিত্রের উত্তম মানব হয়ে গিয়েছিলেন। ওলি আল্লাহ্ হয়ে গিয়েছিলেন।

সাহাবায়ে কেরামের চরিত্র দেখুন তারা কত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। স্মরণ রাখবেন অসভ্য মানুষকে সভ্য মানুষ বানানো তরবারি দিয়ে সম্ভব নয়। দোয়া দিয়ে সম্ভব এবং একমাত্র দোয়া দিয়েই সম্ভব। আল্লাহ্ তাঁর নিজ অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে নবীগনের দোয়া কবুল করেন। যুগে যুগে নবীগণের দোয়ার কল্যাণে মানব জাতি আজ সভ্যতার এই পর্যায়ে এসেছে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দোয়া এ যুগেই শেষ হয়ে যায় নি। দরুদ শরিফ পড়ে দেখুন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দোয়া আজও কবুল হচ্ছে। এবং হতে থাকবে। আপনি আল্লাহ্‌কে ও রসুল (সা.)কে ভালবেসে দুরুদ পাঠ করুন এবং আল্লাহ্ তা'লার আদেশ মেনে চলুন। আপনার দোয়া কবুল হবে।

এ যুগে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)কে আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)এর ধর্মকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে। ইসলামকে সকল দেশের সকল রং এর মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য। হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর জামাত আহমদীয়া মুসলিম জামাত হযরত ইমাম মাহদী (আ.) খলীফার হেদায়েত অনুসারে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচারকে ছড়িয়ে দেয়ার কাজে রাত দিন ব্যাস্ত আছে।

আজ পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির আহমদীরা আল্লাহ্‌র নিদর্শন দেখছে। দোয়া কবুলের নিদর্শন দেখছে। সকল দেশে হাজার হাজার আহমদী এমন আছেন যারা সাক্ষ্য দিবেন যে আল্লাহ্ তা'লা তাদের দোয়া কবুল করেন। জামাতের পত্র পত্রিকা দেখুন।

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন: "আমি আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলতে পারি যে, আমার হাজার হাজার দোয়া কবুল হয়েছে। লিখলে অনেক বড় বই হবে।" (হাকিকাতুল ওহী পৃ: ৩২১)

হাকিকাতুল ওহী বা তিরিয়াকুল কলুব ইত্যাদি গ্রন্থে অনেক দোয়া কবুলের ঘটনার উল্লেখ আছে। হাজার হাজার আহমদী সাক্ষ্য দিবে যে তাদের দোয়া কবুল হয়।

আমি আজকের এই সুযোগে সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি-যারা আল্লাহ্‌র সম্পর্কে জানতে চান আল্লাহ্‌র নিদর্শন দেখতে চান তারা আহমদীয়া জামাতের ইমাম বা যুগ খলীফার হাতে দীক্ষা নিন, বয়আত করুন। হযরত খলীফা সাহেবের কাছে আবেদন করুন তিনি যেন দোয়া করেন। আপনি যদি খাঁটি অন্তকরনে পবিত্র নিয়্যতে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য বা নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে বয়আত করেন। আপনি আল্লাহ্‌র নিদর্শন দেখবেন। আল্লাহ্‌র সীমাহীন অনুগ্রহ ফযল ও রহমত লাভ করবেন।

লোগো কে এঁহি নূরে খোদা পাও গে

লো তুমহে তওর তাসাল্লি বাতায়া হামনে

"হে লোক সকল! তোমরা আমার কাছে আস, এখানে আল্লাহ্‌র নূর লাভ করবে। তোমাদের জন্য সান্তনা ও শান্তি লাভের পথ বাতলে দিলাম।" (দূরের ছামীন)

আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে চলা উচিত। চেষ্টা না করলে আল্লাহ্‌কে পাওয়া যায় না। আল্লাহ্‌কে পাওয়ার চেষ্টা না করা নির্বুদ্ধিতা ও অহংকার প্রদর্শন।

আল্লাহ্ সম্পর্কে হযরত ইমাম মাহদী মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন: "আমাদের খোদাই আমাদের স্বর্গ। আমাদের খোদাতেই আমাদের আনন্দ। আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি এবং তাঁহাকে সকল সৌন্দর্য্যের অধিকারী পাইয়াছি। প্রাণের বিনিময়ে হলেও এই সম্পদ লাভ করিবার যোগ্য।" (কিশতিয়ে নূহ)

আমার নিজের অভিমত এই যে, চেষ্টা করলে অবশ্যই আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভ করা যায়। আমি মানতে পারি না যে, চেষ্টা করেও আল্লাহ্‌র সন্ধান পাওয়া যায় না। আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আমি গভীর তত্ত্ব-কথা, মারেফাতের কথায় না গিয়ে সহজ ভাবে এতটুকু বলতে চাই যে আপনারা তবলীগে ঝাঁপিয়ে পড়ুন আল্লাহ্‌র নিদর্শন দেখবেন। কারন যারা তবলীগে নেমেছেন তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন দেখেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা শুধু আছেন তা-ই নয় বরং মানুষ সব সময় আল্লাহ্‌র নিদর্শন দেখছে এবং দেখতে থাকবে। যেমন কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, 'কুল্লা ইয়াওমিন হুয়া ফি শান' অর্থাৎ সর্বক্ষন আল্লাহ্ তা'লার মহিমা বিকশিত হচ্ছে। একদিন সব মানুষ আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেছেন, খোদা তাআলা চাহিয়াছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল সাধু প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে, তাহারা ইউরোপেই বাস করুক বা এশিয়াতেই বাস করুক তওহীদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তাঁর ভক্তদের বা দাসদেরকে এক ধর্মে একত্রিত করেন। ইহাই খোদা তা'লার অভিপ্রায় আর এজন্যই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি। (আল ওসীয়্যত পৃ:১৭) অর্থাৎ একদিন অধিকাংশ মানুষ বরং প্রায় সবাই আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে এবং তৌহিদে বিশ্বাস আনয়ন করবে।

আল্লাহ্ তা'লা মানব জাতির উপর দয়া করুন। মানুষ তাড়াতাড়ি হেদায়াত পাক। আল্লাহ্‌র প্রতি সবারই ঈমান লাভ হোক। আল্লাহ্ তা'লা জোর-জবরদস্তি করেন না। যারা আল্লাহ্‌কে মানবে না তারা শেষ হয়ে যাবে। তারাই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ করবে যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে স্বীকার করবে।

[আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৮৮তম সালানা জলসার নির্ধারিত বক্তব্য]